স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘শত কণ্ঠে কর গান’

স্বর্ণকুমারী দেবীর **‘শত কণ্ঠে কর গান’** কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই কবিতায় কবি দেশমাতৃকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ, স্বনির্ভরতার আদর্শ এবং বিদেশি পণ্য বর্জনের আহ্বান অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। কবিতাটি রচিত হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন বাংলার মানুষ ব্রিটিশ শাসনের অধীনে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে শোষিত হচ্ছিল। বিশেষ করে স্বদেশি আন্দোলনের আদর্শ এই কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে। কবি শুধু আবেগপ্রবণ দেশপ্রেমের কথা বলেননি; তিনি দেশকে ভালোবাসার বাস্তব উপায়ও দেখিয়েছেন।

কবিতার শুরুতেই কবি আহ্বান জানিয়েছেন—

“শত কণ্ঠে কর গান জননীর পুত নাম”। এই আহ্বানের মাধ্যমে তিনি দেশের প্রতিটি মানুষকে মাতৃভূমির গৌরবগাথা গাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। এখানে ‘জননী’ বলতে বঙ্গমাতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মতে, দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের সর্বোত্তম উপায় হলো দেশের গৌরবকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া এবং তার সম্মান রক্ষা করা। তাই তিনি সবাইকে একযোগে মাতৃভূমির বন্দনায় মুখরিত হতে বলেছেন। ‘শত কণ্ঠ’ শব্দবন্ধটি কেবল সংখ্যার দিক থেকে নয়, বরং সমগ্র জাতির সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রতীক। এরপর কবি যখন বলেন— “মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।” তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কবি সমগ্র জাতির সামনে একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, দেশের সম্মান রক্ষা করাই হবে তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। এখানে ‘মায়ের মান’ বলতে দেশের মর্যাদা, স্বাধীনতা, সংস্কৃতি ও আত্মসম্মানকে বোঝানো হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষ ও বাংলার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিল। তাই কবি মনে করেন, দেশের প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য হলো দেশের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আত্মনিয়োগ করা।

কবি আলোচ্য কবিতায় পরনির্ভরতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন, যে জাতি অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, সে জাতি কখনও সম্মান অর্জন করতে পারে না। তাই তিনি আত্মনির্ভরতার শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। স্বনির্ভরতা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, মানসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কবির মতে, নিজেদের শ্রম, মেধা ও উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ভিক্ষার মানসিকতা ত্যাগ করে আত্মবিশ্বাস ও কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতিকে এগিয়ে যেতে হবে। তাই কবি বলেন– “এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।” অর্থাৎ আত্মনির্ভরতার আদর্শকে তিনি ধর্মীয় সাধনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন একজন সাধক সারাজীবন একটি মন্ত্র জপ করেন, তেমনি দেশের প্রতিটি মানুষকে সারাক্ষণ স্বদেশপ্রেম, আত্মনির্ভরতা এবং দেশসেবার আদর্শে অবিচল থাকতে হবে।

কবি সর্বতোভাবে দেশবাসীকে বিদেশি পণ্য বর্জনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে বলেছেন। মহাশূন্যকে সাক্ষী রেখে কবি প্রতিজ্ঞা করছেন যে তিনি আর বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করবেন না, যা স্বদেশি আন্দোলনের মূলনীতি ছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় কাঁচামাল নিয়ে গিয়ে বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করে আবার ভারতেই বিক্রি করত। ফলে দেশীয় শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভারত অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল

হয়ে পড়ে। কবি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে দেশবাসীকে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানিয়েছেন। আবার দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে মায়ের দারিদ্র্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি মনে করেন, দেশের দারিদ্র্য দূর করার দায়িত্ব দেশের সন্তানদেরই। বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করলে দেশের কারিগর, কৃষক ও শিল্পপতিরা লাভবান হবেন। এর ফলে দেশের সম্পদ দেশের মধ্যেই থাকবে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে। এইভাবে মাতৃভূমির দারিদ্র্য দূর হবে।

কবি মনে করেন, দেশীয় পোশাক হয়তো বিলাসবহুল নয়, এমনকি ছেঁড়া বা সাধারণও হতে পারে; কিন্তু সেটিই গর্বের বিষয়। কারণ, এই পোশাক দেশের শ্রমিক ও তাঁতিদের শ্রমের ফসল। বিদেশি বিলাসী পোশাকের তুলনায় দেশীয় সাধারণ পোশাকই অধিক সম্মানের। কবির মতে, দেশপ্রেমের পরিচয় বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়, বরং নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মমর্যাদাবোধে। তাই তিনি দেশীয় পোশাক পরিধান করাকেই ধন্য বলে মনে করেছেন। তাই কবি বলেন— "মায়ের দীনতা-লাজ হবে দূর-পরাহত।" অর্থাৎ কবি আশা প্রকাশ করেছেন যে, স্বদেশি আদর্শ বাস্তবায়িত হলে দেশের দারিদ্র্য ও অপমান দূর হবে। দীর্ঘদিনের শোষণের ফলে দেশ যে লজ্জা ও দুর্দশার মধ্যে ছিল, তা স্বনির্ভরতা ও ঐক্যের মাধ্যমে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

আলোচ্য কবিতায় কবি 'ধর্ম' বলতে কোনো বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ বোঝানো হয়নি; বরং নৈতিক কর্তব্য বোঝানো হয়েছে। কবির মতে, দেশের সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের কল্যাণে কাজ করাই মানুষের জীবনের প্রধান কর্ম হওয়া উচিত। এই আদর্শের মাধ্যমে কবি দেশপ্রেমকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই কবি মনে করেন— "এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ।" এখানে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তির পথ নির্দেশ করা হয়েছে। কবির বিশ্বাস, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং বিদেশি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, আর সেই মুক্তিই রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তি রচনা করবে। তাই দেশীয় বস্ত্রকে তিনি মুক্তির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন।

কবি বঙ্গমাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন— "নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি, তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।" অর্থাৎ দেশের প্রতি ভালোবাসা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণি, ধর্ম বা লিঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সমগ্র জাতির অনুভূতি। কবির মতে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই দেশের উন্নতি সম্ভব। তাই তিনি জাতীয় ঐক্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সব মিলিয়ে **'শত কণ্ঠে কর গান'** কবিতাটি কেবল একটি দেশাত্মবোধক কবিতা নয়; এটি একটি জাতীয় জাগরণের আহ্বান। এই কবিতায় দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদা, স্বনির্ভরতা, বিদেশি দ্রব্য বর্জন, স্বদেশি শিল্পের উন্নয়ন, জাতীয় ঐক্য এবং মাতৃভূমির প্রতি অগাধ শ্রদ্ধার আদর্শ একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। কবি দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত দেশপ্রেম কেবল মুখের কথা নয়; বরং দৈনন্দিন জীবনে দেশীয় পণ্য ব্যবহার, আত্মনির্ভর হওয়া এবং দেশের সম্মান রক্ষার জন্য নিরন্তর কাজ করার মধ্যেই তার বাস্তব প্রকাশ।